বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

স্নাতক সাম্মানিক শ্রেণী

বাংলা বিভাগ

২০২২-২০২৩

রেজিস্ট্রেশান নং – **VU211041506 of 2021-2022**

রোল – **UG/1113155** নং – **210023**

গবেষণাধর্মী প্রকল্প রচনা

SEC – II / IV SEM

-:বিষয়:-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে প্রেম ভাবনা

তত্ত্বাবধায়কের নাম – ড ছবি সরকার
ড আশিস অধিকারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – এর ‘ চোখের বালি ’ উপন্যাসে প্রেম ভাবনা

বিষয় – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – এর ‘ চোখের বালি ’ উপন্যাসের প্রেম ভাবনা

স্বাক্ষর – দেবশ্রী জানা

তারিখ – 2২.09.202৩

স্থান – বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর –

তারিখ – ০৫, ০৫, ২৩

স্থান – বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা

বাঙালি জাতির একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক তথা বিশ্ব কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন অগ্রনী বাঙালি কবি, উপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকার, ছোট গল্প কার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা,কন্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাকে বাঙলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২ টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৪ টি নাটক, ১৩ টি উপন্যাস ও ৩৬ টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য সংকলন তার জীবন দশায় বা নৃত্য অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয় তার সর্বমোট ৯৫ টি ছোট গল্প ও ১৯১৫ টি গান যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতা বিতান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত ও গ্রন্থকারে অপ্রতাসশত রচনা ৩২ খন্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পত্র সাহিত্য ১৯ খন্ডে চিঠিপত্র ও চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত। এছাড়াও তিনি প্রায় ২০০০ ছবি এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি এশিয়াদের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভাব গভীরতা, গীতিধর্মীতা চিত্ররুপময়তা অধ্যাত্ম চেতনা, ঐতিহ্য প্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, রোমান্টিক ও সৌন্দর্য চেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য বাস্তব চেতনা ও প্রগতি চেতনা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও ভাষা কাব্যিক। ভারতের ধ্রুপদী ও লৌকিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চেতনা ও শিল্প দর্শন তার রচনার গভীর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। কথা সাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্ক নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন সমাজ কল্যাণ এর উপর হিসেবে তিনি গ্রমোন্নয়ন ও গ্রমোন্নয়ন দরিদ্র মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ্যতা জানিয়েছিলেন পূর্নচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের দেব বিগ্রহের পরিবর্তনে কর্মী অথাৎ মানুষ ঈশ্বর এর পূজার কথা বলেছিলেন সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের গান তার অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি তার রচিত জন গন মন অধিনায়ক জয় হে ও সোনার বাংলা গান দুটি যথাক্রমে ভারত প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত মনে করা হয়।

শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীত শিলালঙ্কা মাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহী হয়ে লেখা হয়েছে। ১৯৪১ সালে তার জীবনের শেষ জন্ম দিনের অনুষ্ঠানে পড়ার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে অন্যতম উপন্যাস বলে মনে করা হয় ‘ চোখের বালি’ উপন্যাসটি। উপন্যাসের বিষয় ‘ সমাজ ও যুগযুগান্তরাগতা সংস্কারের সঙ্গে ব্যাক্তি জীবনের বিরোধ ’ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি উপন্যাসটিকে সামাজিক মনস্তাত্বিক উপন্যাসে বলা হয়। ১৯০১ – ১৯০২ সালে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে [illegible] আকারে প্রকাশিত হয়।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অগ্রনী বাঙালি কবি , উপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা , নাট্যকার , চিত্র কর, প্রাবন্ধিক , অভিনেতা , কন্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাত্মা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস বাংলা ভাষায় তার অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্য কর্ম। ১৮৮৩ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট ১৩ টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন এছাড়া একটি অসমাপ্ত উপন্যাস ও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসমাপ্ত উপন্যাসটি তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। করুনা। বাদ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট উপন্যাসের ধার ১৩ টি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস লেখার প্রথম প্রচেষ্টা হলো 'করুনা' । মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি এটি লিখেছিলেন। এটি 'ভারতীয়' পত্রিকায় ১৮৭৭ – ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীতে ' করুনা ' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির পরিশেষে হয়নি বলে এটি উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি (অসমাপ্ত উপন্যাস) ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাস গুলি হল –" বৌ – ঠাকুরনীর হাট " (১৮৮৩) , " রাজর্ষি " (১৮৮৭), " চোখের বালি "(১৯০৩), " নৌকাডুবি "(১৯০৬), " প্রজাপতির নির্বন্ধ "(১৯০৮), " গোরা "(১৯১০), " ঘরে – বাইরে "(১৯১৬), " চতুরঙ্গ "(১৯১৬), " যোগাযোগ "(১৯২৯),

" শেষের কবিতা "(১৯২৯), " দুই বোন "(১৯৩৩) , " মালঞ্চ "(১৯৩৪), " চার অধ্যায় "(১৯৩৪)।

- **বৌ– ঠাকুরনীর হাট :**
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গ্রন্থকারে প্রকাশিত উপন্যাস হল 'বৌ – ঠাকুরনীর হাট'।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকার জমিদার রামচন্দ্রের বিবাদকে উপজীব্য করে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বৌ – ঠাকুরনীর হাট অবলম্বনে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের ' প্রায়শ্চিত্ত ' নাটকটি। প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পুর্নলিখিত হয় ' পরিত্রাণ ' নামে মুদ্রিত হয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' বৌ – ঠাকুরনীর হাট ' উপন্যাসের প্রশংসা করেছেন।

'বৌ – ঠাকুরনীর হাট ' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৫৩ সালে 'বৌ –ঠাকুরনীর হাট ' নামে একটি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন নরেশ মিত্র।

- রাজর্ষি :

জর্জিয়া হলো ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটি মানবতা পক্ষে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে রাজর্ষি উপন্যাসে প্রথম অংশের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় তার বিখ্যাত নাটক ' বিসর্জন ' ।

- **চোখের বালি :**

চোখের বালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। ১৯০১ – ১৯০২ সালে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

চোখের বালি উপন্যাসের বিষয় ' সমাজ ও যুগ যুগান্তরাগত সংসারের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের বিরোধ ' । আখ্যানভাগ সংসারের সর্বময় কর্ত্রী মা, এক অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ ও তার প্রতি অকুষ্ট দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

১৯০৪ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। ১৯৩৮ সালে অ্যাসোসিয়েট পিকচার্সের প্রয়োজনায় চোখের বালি অবলম্বনে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। ২০০৩ সালে বিশিষ্ট পরিচালক ঋতুপর্ণা ঘোষ এই উপন্যাস অবলম্বনে চোখের বালি নমে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। চোখের বালি ইংরেজি (২ বার), হিন্দি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়।

- **নৌকাডুবি :**

নৌকাডুবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৩১০ – ১৩১১ বঙ্গাব্দ বঙ্গদর্শন প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নৌকাডুবি উপন্যাসটি লেখা হয়েছে জটিল পারিবারিক সমস্যা গুলিকে কেন্দ্র করে।

- **প্রজাপতির নির্বন্ধ :**

প্রজাপতির নির্বন্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতৃক রচিত একটি হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। এটি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (' হিতবাদীর উপহার ') সংঅদনের চিরকুমার সভা নামে উপন্যাসের নাট্যরূপটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রজাপতির নির্বন্ধ এটি সর্ব মোট ১৬ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

- **গোরা :**

গোরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ তম উপন্যাস। দেশ পত্রিকায় বিচারে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস। গোরা ১৮৮০ এর দশকে ব্রিটিশ রাজত্বকালে সময়কার কোলকাতার পটভূমিতে লেখা। এটি লেখার ক্রমে পঞ্চম এবং রবীন্দ্রনাথের তেরোটি উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ তম । এটি রাজনীতি এবং ধর্ম নিয়ে দার্শনিক বিতর্ক সমৃদ্ধ উপন্যাস। উপন্যাসে মুক্তি, সর্বজনীনতা, ভাতৃত্ব, লিঙ্গ, নারীবাদ, বর্ন, শ্রেণী, ঐতহ্য বনাম আধুনিকতা, নগর অভিজাত বনাম গ্রামীন কৃষক, ঐপনিকবেশিক শাসন, জাতীয়তাবাদ এবং ব্রম্মা সমাজ নিয়ে লেখা রয়েছে।

- **ঘরের বাইরে :**

ঘরের বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম এই ঘরের বাইরে। ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাস অবলম্বনে ঘরের বাইরে নাম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

- **চতুরঙ্গ :**

চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এটি সাধুভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। এটিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়।

চতুরঙ্গ উপন্যাসটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীবিলাস (বর্ন কারী) নামে এক যুবকের যাত্রা, তাঁর সর্বোত্তম বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক শচীশের সাথে তাঁর সাথ্যাৎ, দামিনী বিধবা এবং আদর্শবাদী ব্যাক্তি জ্যাঠামশায়ের গল্প নিয়ে উপন্যাসটি লিখিত।

২০০৮ সালে সুমন মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি অবলম্বনে চতুরঙ্গ চলচ্চিত্র খানি নির্মাণ করেন।

- **যোগাযোগ :**

অন্যতম সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যোগাযোগ। বিচিত্রা মাসিক পত্রে ধারাবাহিক রুপে প্রকাশিত হয় (আশ্চিন,১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫) । পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল তিন পুরুষ।

- **শেষের কবিতা :**

শেষের কবিতা হলো রোম্যান্টিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বলে বিবেচিত হলেও অনেক দুর্বলতা রয়েছে। বলা হয়, এই উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ লিখলে এতটা জনপ্রিয় হতো না।

- **দুই বোন :**

দুই বোন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরকীয়া সম্বন্ধীয় একটি মিলনান্তক উপন্যাস। এটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ – ১৯৩৩ সালে ' বিচিত্রা ' পত্রিকায় বের হয়।

- **মালঞ্চ :**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মালঞ্চ একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পরকীয়া সংক্রান্ত উপন্যাস। নরনারীর জটিল সম্পর্ক নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস।

- **চার অধ্যায় :**

চার অধ্যায় হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উৎপল দত্ত উপন্যাসটির নাট্যরূপ মাঞ্চারন করেছিলেন। চার অধ্যায় উপন্যাসটি ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

চার অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ উপন্যাস এই উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ' রবিবার ' গল্পের সম্পর্ক আছে।

১৯৩৪ সালে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ উপন্যাস চার অধ্যায় অবলম্বনে হিন্দি ভাষার একই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন কুমার সাহানি, এবং এনার চার অধ্যায় নামে বাংলা ভাষায় ২০১৩ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বাপ্পাদীত্য বন্দোপাধ্যায়।

চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ উপন্যাস ' চোখের বালি ' এই উপন্যাসের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম চন্দ্র সম্পাদিত ' বঙ্গদর্শন ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ কাল ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ১ লা জৈষ্ঠ ইংরেজি ১৫ মে ১৯০১ এবং ১৯০২ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির প্রথম নাম ছিল ' বিনোদিনী ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় এর নাম দেওয়া হয় ' চোখের বালি ' এবং নামকরণটি শেষ পর্যন্ত টিকে যায়।

একাধিক ভাষায় প্রকাশিত হয় ' চোখের বালি ' উপন্যাসটি ১৯৫৯ সালে রুশ ভাষায় ১৯৬১ সালে চীনা ভাষায় ১৯৬৮ সালে জার্মান ভাষায় তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও আনন্দিত হয় উপন্যাসটি।

এছাড়া এই উপন্যাসটি অবলম্বনে দুটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। যা যথাক্রমে ১৯৩৮ ইং এবং ২০০৩ ইং সালে মুক্তি পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ' চোখের বালি ' উপন্যাসটি দেখা গিয়েছে নায়িকা চরিত্রে বিনোদিনী তার মা পরিমিত এবং নায়ক চরিত্রে মহেন্দ্র তাঁর মা রাজলক্ষ্মী দু জনে বাল্য কালের বন্ধু। রাজলক্ষ্মী দেবী চান তার ছেলে মহেনন্দ্রের সাথে হরিমতির মেয়ে বিনোদিনীর বিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ হিসেবে ঘরে তুলতে চান। কিন্তু মাত্রিস্নেহ হারানোর দোহাই দিয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মায়ের প্রতি ছেলের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে এ বিষয়ে বেশি দূরে এগোতে পারেনি রাজলক্ষ্মী দবী। অবশেষে অন্যত্র বিয়ে হয় বিনোদিনীর এক ঘাটের মড়ার সাথে এবং কিছু দিনের মধ্যেই বিধবা হতে হয় বিনোদিনীকে।

অন্যদিকে মহেন্দ্রের কালিমা অন্নপূর্ণা, স্বামী – সন্তান হীনা ইনি মহেন্দ্রকে সন্তানের মত স্নেহ করতো। অন্নপূর্ণার পিত্রিমাতৃ হীনা এক বোনঝি আশালতার সাথে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করলেও প্রত্যাক্ষিত হওয়ার আশংকায় তা প্রকাশ করতো না। অবশেষে মহেন্দ্রের চেষ্টায় তারই বন্ধু বিহারীর সাথে বিয়ে ঠিক করে মেয়ে দেখার জন্য কাকিমাকে প্রস্তাব করে সে। বিহারী মহেন্দ্রের বন্ধু হলেও মা – কাকীর কাছে স্নেহের পাত্র ছিল সবসময়। আশালতাকে দেখতে গিয়ে মহেন্দ্রে –

নিজেই নিজের জন্য পছন্দ করে ফেলেছে। এবং আশালতাকে বিয়ে করার জন্য মা কে থানায় ও এই কথা শুনে তিনি অমত করেন। অবশেষে রাজলক্ষ্মী দেবী ছেলেকে কষ্ট দিতে চান না তাই বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। এবং মহেন্দ্র আশালতাকে বিবাহ করে বাড়িতে আনলেন।

রাজলক্ষ্মী অপরিমিত উৎসাহে বধূকে ঘরকন্নার কাজ প্রবৃত্ত হইলেন। এই সব দেখে মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল –

"কাকী, মা বউকে যে রুপ কাটাইয়া মারিতেছেন,
আমি তো দেখিতে পারি না। "

মহেন্দ্র চায় তার নববধূকে শিক্ষিত করতে এবং পড়াশোনার জন্য বই পত্র কিনে আনে। এই সব দেখে রাজলক্ষ্মী খুব ক্রুদ্ধ হয় ।

রাজলক্ষ্মী এই বিয়ের জন্য দায়ী করেন অন্নপূর্ণাকে। এই সব নিয়ে রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয় এবং বলে –

" মাপ করো মেজোগিন্নি , মাপ করো।
তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি বুঝতে পারি নাই ;
উহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি,
এখন তুমি উঁহাকে ধুইয়া – মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিষের হাতে দাও –
উনি পায়ের ওপর পা দিয়া লেখা পড়া শিখুন,
দাসীবৃত্তি আমি করিব। "

রাজলক্ষ্মীর এমন ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে কাশিতে চলে যান। এবংতিনি ধর্ম পালনের দোহাই দেন।

অন্যদিকে রাজলক্ষ্মী দেবী ছেলের ওপর মায়ের ভালোবাসা পরীক্ষা করতে তিনি কয়েক

দিনের জন্য চলে যান গ্রামে বাড়িতে। সেখানে থাকা কালীন রাজলক্ষ্মী দেবীর প্রতি বিনোদিনীর সেবা যত্ন দেখে তিনি খুশি হয়ে কোলকাতায় ফেরার পথে বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। কোলকাতায় এসে বিনোদিনী কয়েক দিনের মধ্যেই সকলকে করে নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। রাজলক্ষ্মী তার কর্তব্য ,বুদ্ধি ও সেবায় মুগ্ধ হলেন। এবং বিনোদিনীকে দেখে আশালতা বন্ধুত্ব করতে। আশার পক্ষে সঙ্গিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। তারা দুজন একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এবং বিনোদিনী আশাকে চোখের বালি বলে ডাকত। বাড়ির সমস্ত কাজ বিনোদিনী করত এবং আশালতার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। খুশি হয়ে আশা তার সই বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের দেখা করাতে চায়। কিন্তু মহেন্দ্র দেখা করতে চায় না। মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হয়ে তার মাকে ডেকে বলে –

> " এ কি ভালো হইতেছে।
>
> পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার কী।
>
> আমার তো ইহাতে মত নাই –
>
> কী জানি , কখন কী সংকট ঘটিতে পারে। "

মহেন্দ্রের কথা শুনে রাজলক্ষ্মী বলে বিপিনের বউ আছে বলেই এই বৃদ্ধবয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হোক বা যা হোক, আপন লোকের কাছথেকে এমন সেবা তো কখনো পাই নাই।

আশা মহেন্দ্রকে অনেক বার বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করার কথা বলাতে। আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে। অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য অনুগ্রহপূর্বক রাজি হয়। এর পর থেকে মাঝ মধ্যে দেখা করে এবং বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের ভালো লেগে যায়। মহেন্দ্রের বিনোদিনীর প্রতি এমন আচরণ দেখে বিহারী বুঝতে পারে এবং মনে মনে ভাবে 'আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হোক, ইহাদের মাঝখানে আমাকে একটা স্থান লইতে হবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাইবে না তবু আমাকে থাকিতে হইবে '।

এই ভাবে কিছু দিনের মধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। মহেন্দ্র আর আগের মতো আশার সঙ্গে ঠিক মতো কথা না বলা ও খারাপ আচরণ করায় আশা কিছুটা বুঝতে পারে।

মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে অনেক ক্ষন কথা বলতে দেখে রাজলক্ষ্মী দেবী বুঝতে পেরে বিনোদিনীকে ডেকে মায়াদিন বলে বন্দনা করে। কারণ মহেন্দ্র ও আশার সুখের সংসারে নিজের যায়গা করতে চায় তাই রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে গ্রামে চলে যেতে বলে। অন্যদিকে বিনোদিনীর প্রেমে মগ্ন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে দূরে চলে যেতে চায়। মহেন্দ্রের এই সমস্ত কথা শুনে রাতেই বাড়ি ছেড়ে বিহারীর বাড়িতে চলে আসে। কারণ এতোদিন সে মহেন্দ্রের সাথে ভালোবাসার নাটক করেছে, সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। এবং সে জানায় বিহারীকে ভালোবাসে তিনি যেন তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু বিহারী জানায় বিনোদিনীকে সে গ্রন্থ করতে পারবে না কারণ তার জন্য একটা সুখের সংসার নষ্ট হয়ে গেছে। বিহারীর এসমস্ত কথা শুনে বিনোদিনী গ্রাম ফিরে আসে ও বিহারীর উত্তরের অপেক্ষায় করে। কয়েক দিন কাটার পরেও যখন কোনো উত্তর পেলনা তখন বিহারীর উদ্যেশ্যে চিঠি লেখে।

আর ঠিক পরের দিন সন্ধ্যায় মহেন্দ্র উপস্থিত হয় বিনোদিনীর বাড়িতে। বিধবা বিনোদিনীর ঘরে মহেন্দ্রকে দেখে গ্রামের মানুষ জন কটু উক্তি করে ও খারাপ মন্তব্য করে। এসব কথা সহ্য করতে না পেরে বিনোদিনী মহেন্দ্রকে বলে সে যেন তাকে শহরে নিয়ে যায়। তার পর মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে আসে পটল ডাঙা শহরের একটি ভাড়া বাড়িতে। বিনোদিনীকে রেখে বাড়িতে চলে আসে মহেন্দ্র। বাড়িত ফিরে সে মাকে থানায় তার বাড়িতে থেকে পড়াশোনার অসুবিধা হয় তাই সে কলেজের কাছেই একটা বাড়ি ভাড়ায় নিয়েছে এখন থেকে সে সেখানেই থাকবে। এই বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসে পটল ডাঙার সেই ভাড়া বাড়িতে যেখানে সে বিনোদিনীকে রেখে দিয়ে এসছে।

কিন্তু বিনোদিনী সেখানে থাকার জন্য নিষেধ করলো। দুর্ভাগ্য বসত সেখান থেকে বেরিয়ে কোথাও যাওয়ার রাস্তা না পেয়ে চলে আসে বিহারীর বাড়ি। কিন্তু গিয়ে দেখে বিহারী বাড়ি নেই। যানতে পারলো অনেক দিন হয়ে গেছে বিহারী এখানে থেকে না এখন এলাহাবাদে আছে।

সেই দিন কোনো আশ্রয় না পেয়ে বিহারীর বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। এবং পরের দিন সকালে সে বিহারীর টেবিলে একটি চিঠি পায় চিঠটি বিনোদিনীর লেখা ও বিহারীর উদ্দেশ্যে, এবং পড়ে যানতে পারল বিনোদিনী তাকে না বিহারীকে ভালোবাসে।

অন্যদিকে বিনোদিনী জানতে পারে বিহারী এলাহাবাদে আছে। তাই কৌশলে বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করে। বিনোদিনীর উদ্দেশ্য যে করেই হোক বিহারীকে খোঁজা ও তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। তার মধ্যে রাজলক্ষ্মী অসুস্থ সহ্যাশীল মহেন্দ্র বাড়ি না থাকায় আশালতা চিঠি লিখে তার মাসি অন্নপূর্ণাকে যেন তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। অন্নপূর্ণা বাড়ি ফিরে এলে রাজলক্ষ্মী দেবী অন্নপূর্ণাকে বলে সে শেষ বারের মত বিহারীকে দেখতে চায়। অন্নপূর্ণা বিহারীর বাড়ি গিয়ে জানতে পারে বিহারী গঙ্গার ধারে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে সেখানেই বিহারীকে পাওয়া যাবে।

এই কথা শুনে অন্নপূর্ণা সেখানে যায় ও বিহারীর সঙ্গে দেখা করে এবং মহেন্দ্রর বাড়িতে নিয়ে আসে। ও এসে জানতে পারে বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্র নিরুদ্দেশ, তাই বিহারী মহেন্দ্রকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিল। খুজতে খুজতে জানতে পারে এলাহাবাদে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠেছে। এবং সেখানে পৌঁছায়, যেখানে বিনোদিনী ও মহেন্দ্র আছে। সেখানে পৌঁছাতেই বিনোদিনী তার অসহায়তার কথা জানায়। তার অসহায়তার কথা শুনে বিহারী বলে যে সে তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু বিনোদিনী বিহারীকে বিয়ে না করার অনুরোধ করে। দুজনের কথবকথনের মাঝে মহেন্দ্র আসে ও বিহারীর মুখে রাজলক্ষ্মী দেবীর অসুস্থতার কথা শুনে সকলে মিলে কলকাতায় ফিরে আসে।

বাড়ি ফিরে মহেন্দ্র মায়ের কাছে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চায় ও আশার কাছে ক্ষমা চায় । মহেন্দ্রের এমন ক্ষমা চাওয়াতে তারা সবাই মহেন্দ্রকে ক্ষমা করে। এবং দুই বন্ধুর আবার আগের মতোই এক হয়ে যায়। এই দেখে রাজলক্ষ্মী বলে –

> " মহিন, আমি তোকে এই আশির্বাদ করি –
>
> শিশুকাল হইতে বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল তেমনি বন্ধু থাক্ –
>
> ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। "

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনোদিনীর কথা যানতে চাইলে বিহারী বলে ওঠে –

" মা , সে তো বাড়ির বাহির ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছে।

তাহাকে আজ সমস্ত দিন জলবিন্দু পর্যন্ত মুখে দেওয়াইতে পারি নাই।

সে পন করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করিবে না। "

এই কথা শুনে রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে বাড়ির ভেতরে ডাকে, বিনোদিনী ভেতরে এসে রাজলক্ষ্মীর পা ধরে বলে আগে তুমি এই পাপিষ্ঠাকে মাপ করো পিসিমা। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে মাপ করে। অবশেষে আশার কাছে মাপ চায়। কিছুদিন পর রাজলক্ষ্মী দেবী মারা যায়, বিনোদিনীর আর কোথাও যাওয়ার পথ না পেয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাঁথি চলে যায়। এই উপন্যাসটি জুড়ে প্রেম – প্রতাপের বিষয়টি এই উপন্যাসটিকে সৌন্দর্য করে তুলেছে।

- **চোখের বালি উপন্যাস অবলম্বনে বিনোদিনীর চরিত্রটি আলোচনা :**

‘চোখের বালি ’ উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনোদিনী এ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্র ও উপন্যাসের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে । প্রশ্ন মোতাবেক এখন আমরা বিনোদিনী চরিত্রটি বিশ্লেষণে প্রয়াস পাব।

উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর আর্বিভাব। বিনোদিনীর পরিচয় সে হরিমতির সুদর্শনা কন্যা। তার রূপে, গুনে সর্বগুনা ছিল। বিনোদিনী দরিদ্র পিতার কন্যা হলেও মেম সাহেবের কাছে পড়াশোনা শিখেছে কিন্তু বিয়ে হয় বিপিন নামে এক ঘাটের মরার সঙ্গে। স্বামী অল্পদিনেই প্লীহা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বিনোদিনী বিধবা হয়, এবং এক সময় রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে কোলকাতার বাসায় নিয়ে আসে। মহেন্দ্র ও আশালতার সুখের দাম্পত্য জীবন দেখে বিনোদিনী যতটুকু তৃপ্ত হয়, তারচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়। রূপে, গুনে, শিক্ষায়, কর্মে সর্বখেত্রে বিনোদিনী শ্রেষ্ঠতর। তবুও বিনোদিনী এসুখ ভোগ থেকে বঞ্চিত। তাই বিনোদিনীর সমস্ত রাগ মহেন্দ্রের ওপর।

বিনোদিনী সুন্দরী, যুবতী বিধবা, মার্জিত, রুচিশীল, শিক্ষিত ও আধুনিকা। এ নকল যৌবন স্বামীর সোহাগ ও ভালোবাসা বঞ্চিত। বিনোদিনী কৌশল নারী চরিত্র। ‘ ধরি মাছ না ছুই পানি ’ এরকম। বিনোদিনী আশাকে’ সই ’ বলে, যাবতীয় কাজ করে দেয়, তার পর আশাকে সুসজ্জিত করে মহেন্দ্রের কাছে পাঠায়। বিনোদিনী কল্পনায় আশার পিছু পিছু মুগ্ধ মহেনের অভিসারে জীবন হীন কক্ষে প্রবেশ করে। আশার ভালোবাসার গল্প শুনে নিজেকে আশার স্থানে কল্পনা করে এক ধরনের সুখ অনুভব করে আবার ইর্ষায় জ্বলে যায়। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনীর উক্তি –

> “আচ্ছা ভাই চোখের বালি,
> তোমার সঙ্গে যদি বিহারীবাবুরবাবুর বিবাহ হইত! ”

চোখের বালি প্রধান উপন্যাস। চরিত্রের নানা রকম গতি প্রকৃতি এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। উনিশতম পরিচ্ছেদে আমার বিনোদিনীর দ্বান্দ্বিক মানসিকতার পরিচয় পাই। বিনোদিনীর ভাষায়, –

> “কোনো নারীর কি আমার মতো দশা হইয়াছে।
> আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই,
> তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ”

সেবা পরায়ণতা নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। দুঃখের সময় বিনোদিনী তাকে বুকে জড়িয়ে রাখে, মায়া – মমতায় ঘেরা বিনোদিনীর মন। উনিশতম পরিচ্ছেদে দেখা যায় – আশা মহেন্দ্রের কাঁদছে। আর বিনোদিনী সখীর চোখের জল মুছে দিচ্ছে। লেখকের ভাষায় –

“ সেবায় সান্তনায়,
নিঃস্বার্থ সখী প্রেমে সে মর্তবাসিনী। ”

সতেরোতম অনুচ্ছেদে দমনের বাগানে মহেন্দ্র , বিনোদিনী , বিহারী ও আশা চড়িভাতি করে। এ দিন বিনোদিনী বিহারীকে নতুন করে আবিষ্কার করে। বিনোদিনীর হৃদয়ে লুকায়িত শত কথা হৃদয় খুলে বিহারীকে শোনায়। বিনোদিনী বুঝতে পারে মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রেম করা যায় কিন্তু বিহারী তার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে আর মনের ক্যাম্পাসে বিহারীর মূর্তি গড়ে। বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখে শুনতে পায় যে, মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, আর বিহারী আশাকে ভালোবাসে। এমন কথা স্পষ্ট শুনে বিনোদিনীর মাথায় খুন চড়ে যায়। সবদিক থেকে বিনোদিনী অবহেলিত, বঞ্চিত। বিনোদিনী ইংরেজি শিক্ষিত, আধুনিক রুচি সম্পন্ন, প্রখর আত্ম সচেতন নারী চরিত্র। প্রেম তার নারীত্বের অধিকার। প্রেমের পথে বাঁধা আসলে দেবী দুর্গার মতো দশ হাত দিয়ে সব প্রতি বন্ধ করা ধ্বংস করতে চায়। মহেন্দ্র ও বিহারী দুই পুরুষের দৃষ্টি শক্তি তীব্র সমালোচনা করে এভাবে –

“ তোমার কী দেখিয়া,
কতটুকু দেখিয়া ভোল।
নির্বোধ ! অন্ধ ! ”

প্রেম বঞ্চিত বিনোদিনী সর্বনাশা প্রেম খেলায় যেতে ওঠে। মহেন্দ্র, বিহারী সবাইকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়। বিনোদিনী মায়াদিন, নারীত্বের মায়া জাল বিস্তার করে। বিনোদিনী সবকিছু ভুলে চলে

আসে গ্রামীন বাড়িতে। কিন্তু শান্তি পায়না, চাতক পাখির মতো বিহারীর চিঠির প্রত্যাশায় থাকে বিনোদিনী।

বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নিয়ে পুতুলের মতো খেলে, খেলা শেষে ছুঁড়ে ফেলে। পক্ষান্তরে বিহারীর কাছে কামালের মতো প্রেম নিবেদন করে কিন্তু শান্ত প্রকৃতির বিহারী প্রথমে বিনোদিনীর প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিহারী বিনোদিনীর জীবন সর্বস্ব । তাই বিহারীর কাছে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ একটা কিছু পার্থনা করে। বিনোদিনী বিহারীর গলা বাহুতে বেষ্টন করে তার অতৃপ্ত অষ্ঠধর এগিয়ে দেয়। আর বিহারী আস্তে আস্তে বিনোদিনীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিহারী নিজেকে সংযত করতে পারেনি। প্রকাশ্যে মহেন্দ্রের সামনে বিনোদিনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিনোদিনী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।

বিনোদিনী চরিত্রে সবধরনের গুনাবলী বিরাজমান। তার বহুমুখী চারিত্রিক প্রতিভার গুনে রাজলক্ষ্মী তাকে স্নেহ করেছে, মহেন্দ্র তার প্রেমে ব্যক্তিত্ব আসন পেয়েছে। আর আশা তাকে সখী হিসেবে ন্যায় সমর্থ বাংলা, সাহিত্য একটি মাইলফলক নারী চরিত্র।

- **চোখের বালি উপন্যাস অবলম্বনে মহেন্দ্র চরিত্রটি আলোচনা :**

‘চোখের বালি ’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নায়ক চরিত্রটি হল মহেন্দ্র। প্রসঙ্গ ক্রমে মহেন্দ্রের চরিত্রটি আলোচনা।

মহেন্দ্রের পরিচয় সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় – সে শৈশবে পিতৃহীন, রাজলক্ষ্মীর সন্তান, বয়স প্রায় বাইশ বছর। এম. এ পাশ করেছে, তার পর ডাক্তারি পড়া শুরু করেছে। যথেষ্ট বয়স ও উচ্চশিক্ষিত হলেও মানসিক পরিপক্কতা এখনও আসেনি। তাই সব কাজে এখনও মায়ের ওপর নির্ভর শীল। সঙ্গত কারণেই লেখক তাকে ‘ ক্যাঙারু শাবক ’ এর সাথে তুলনা করেছেন। মহেন্দ্র আলালের ঘরে দুলালের মতো। নিজের ইচ্ছা ও মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্যের মতামত যৌক্তিক হলেও তার কাছে মূল্যহীন মহেন্দ্র জেদি সভাবের চরিত্র।

স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালিপনা মহেন্দ্র চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। নিজের পছন্দ আর স্বার্থের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। মনমতো না হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাই রাজলক্ষ্মীর পছন্দের মেয়ে বিনোদিনীকে মহেন্দ্র বিয়ে করতে অস্বীকার করে, কিন্তু দেখাশুনার পর মহেন্দ্র তার চিরকালের বন্ধু বিহারীকে বঞ্চিত করে নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আশাকে বিয়ে করে। মহেন্দ্র তার কোন ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখতে চায়না।

বিয়ের পর মহেন্দ্র চরিত্রের পূর্ব উন্মোচিত হয়। মহেন্দ্র যে কতটা টস্রন স্বভাবের দুর্বল চরিত্র, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশার পড়াশোনার জন্য স্লেট, খাতা চারুপাঠ কিনে আনে আর লেখা পড়ার অজুহাতে স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে রেখে। পত্নী প্রেমে সে অসংযামী, অসংযত, অন্ধ। লোলুপ তা, নারী আসক্তি তার চরিত্রের অন্যতম দিক। প্রকাশ্যে দাম্পত্য লীলায় মেতে থাকে। মহেন্দ্র বেহায়াপনার সর্বোচ্চ পর্যায় পৌঁছে এবং লজ্জার মাথা খেয়ে রাজলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বলে –

> “ বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো
> অত খাটিয়ে দিতে পারব না। ”

পত্নী প্রেমের বাড়াবাড়িতে মহেন্দ্র সে বছর ডাক্তারি পরীক্ষায় ফেল করে।

আত্ম অহংকার মহেন্দ্র চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই আত্ম গৌরবে মহেন্দ্র বিনোদিনীর সাথে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেনি। কিন্তু চোদ্দোতম অনুচ্ছেদে মহেন্দ্র আত্ম গৌরব বিসর্জন দিয়ে বিনোদিনীর কাছে আসে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি –

> " এমনই করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে
>
> আলাপ বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। "

পূর্বে মহেন্দ্র একবার ফটোগ্রাফ শিখতে শুরু করে ছিল। বিনোদিনীকে দেখে আবার ফটোগ্রাফ শেখার নেশা চাপে। মহেন্দ্রের প্রেম এ শখের নেশা থেকে উৎপত্তি। বিনোদিনী তার নিটোল যৌবনে মায়াবী ফাঁদ পাতে, আর মহেন্দ্র উড়ে চলা কীটপতঙ্গের মতো সে ফাঁদে ধরা দেয়। মহেন্দ্র মুখে বলে আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসে না কিন্তু পূর্ব মূহুর্তে মহেন্দ্রের হৃদয়ে অনুতাপের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

আশা কাশি যাওয়ায় মহেন্দ্র লাগাম ছাড়া হয়ে যায়। পত্নী প্রেম শূন্যে নেমে যায়, মহেন্দ্র পর নারীর প্রতি নেশাগ্রস্থ। বিনোদিনীর দেহ ভরা যৌবনের মোহে মহেন্দ্র ঘর সংসার, দাম্পত্য জীবন, মা, কাকীমা, বন্ধু সবাইকে পরিত্যাগ করার মত অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত নেয়। বিনোদিনীকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে কোলকাতার পটলডাঙার বাসায় ওঠে। ঘরে অসুস্থ মাকে রেখে মহেন্দ্র নিলজ্জভাবে পটলডাঙার বাসায় বিনোদিনীর সাথে দেখা করতে যায়।

মহেন্দ্র যে কোন মূল্যে বিনোদিনীকে পেতে চায়। বিনোদিনী তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে কিন্তু ধরা দেয় না। মহেন্দ্র বিহারীর বাসায় বিনোদিনীর হাতের লেখা একটি চিঠি পায়। তার পর মহেন্দ্রের মোহ ভঙ্গ হয়। মহেন্দ্র এতক্ষণে বুঝতে পারল বিনোদিনী বিহারীকে পাওয়ার জন্য মহেন্দ্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। অনেক দেরিতে হলেও মহেন্দ্র চরিত্রের আত্মা উপলব্ধি ঘটেছে।

মহেন্দ্র নিজের অপকর্মের প্রকৃতি অনুধাবন করছে। অন্নপূর্ণার কাছে নিজেকে পাপিষ্ঠ বলে পরিচয় দেয়। অত্যন্ত দূর্বল ব্যক্তিত্ব আর কাপুরুষিত আচরণের জন্য মহেন্দ্রের হৃদয় আজ ক্ষত বিক্ষত। এই বিক্ষত হৃদয় নিয়ে আশার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। বিহারীর বন্ধুত্বের মর্যাদা পুনপ্রতির্ষ্ঠিত করে আর জন্ম দুঃখিনী মায়ের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। এই ভাবে মহেন্দ্রের নায়ক চরিত্রটি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

- **চোখের বালি উপন্যাস অবলম্বনে বিহারী চরিত্রটি আলোচনা :**

' চোখের বালি ' উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র হল বিহারী। বিহারী চরিত্রটি আলোচনা করা হল –

এই বিহারী চরিত্র অবলম্বনের মাধ্যমে দেখা যায় যে, বিহারী ছোটো থেকেই পিত্রি – মাতৃহীন। ছোট থেকেই সে একা কিন্তু তার ছোট বেলাকার বন্ধু মহেন্দ্র এবং তার মা, কাকিমা কখনো তা বুঝতে দেয়নি। মহেন্দ্রের মা , কাকিমা মহেন্দ্রের মতোই খুব ভালোবাসে নিজের ছেলের মতো, এবং নিজের চেষ্টায় ডাক্তারি পড়াশোনা করে।

একদিন অন্নপূর্ণা তার বোনঝি আশালতার কথা বলেন। মহেন্দ্র ও বিহারী দু – জন মিলে আশাকে দেখতে যায় ও দু – জনেরই আশাকে পছন্দ হয়। কিন্তু ছোট বেলাকার বন্ধুত্ব নষ্ট করার ভয়ে মহেন্দ্রের সাথে আশার বিবাহ দেয়।

এবং পরবর্তী কালে বিধবা বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে মত্ত ও বিহারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন কিন্তু বিহারী তার প্রস্তাবে রাজী নয়। পরে তার মত পাল্টালেন তখন নিজের দোষ স্বীকার করে বিনোদিনী থানায় যে সে যেন তাকে বিবাহ না করে।

অবশেষে বিহারী গঙ্গার ধারে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খোলে। সমস্ত গরিব মানুষদের বিনামূল্যে সেবা করেন।

এখানে এই উপন্যাসের মধ্যে বিহারী চরিত্রে দেখা যায় যে বিহারী একটি দয়ালু ও বড়ো মনের ব্যক্তি। এই উপন্যাসে বিহারী একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিশেষ বিশেষ উপন্যাস গুলির মধ্যে “ চোখের বালি ” উপন্যাসটি বিশেষ একটি উপন্যাস বলে মনে করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বড়মাপের শিল্পী। তিনি চরিত্র গুলির গতি প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে উপন্যাসের নাম করন করেছেন। ‘ চোখের বালি ’ এটি একটি চরিত্র প্রধান উপন্যাস। নারী – পুরুষ নির্বিশেষে একটির সাথে আর একটি চরিত্রের সম্পর্ক নির্ণয় এবং চরিত্র গুলোর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের প্রধান দিক। বিহারী ও মহেন্দ্র পরস্পর বন্ধু। কিন্তু উপন্যাসের এক পর্যায়ে এরা একে অপরের শত্রুতে পরিনত হয়েছে। আবার বিনোদিনী এবং আশালতার প্রথম দিকে সখী বলে মনে হলেও অবশেষে আশা বুঝতে পারে যে বিনোদিনী কতটা সর্বনাশ করেছে। অন্নপূর্ণা আর রাজলক্ষী এই দুই নারীর সম্পর্ক অত্যন্ত হলেও, শেষ পর্যায়ে তারা একে অপরের কাছে চোখের বালিতে পরিনত হয়েছে। সুতারাং এই উপন্যাসের গুরুত্ব পূর্ন ৬ টি চরিত্রের গতি প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে ‘ চোখের বালি’ নামকরণ অত্যন্ত যুক্তি যুক্ত ও সাথক হয়েছে। নামকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০

২ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১

৩ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৮

৪ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৩

৫ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৫

৬ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৫

৭ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৭

৮ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৮

৯ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪১

১০ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫২

১১ . ‘ চোখের বালি ’ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ , পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১

সহায়কগ্রন্থ

আকরগ্রন্থ :

চোখের বালি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এস্. ব্যানার্জী এন্ড কোং, ৬ ডি, রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯

অন্যান্য তথ্য :

- https://www.librarianvoice.org/review–2/
- https://www.banglasahitto.in/2021/01/rabindranath–and–his–hovels.html

11.09.23.

External Examiner
Dept. of Bengali
MAHISHADAL RAJ COLLEGE

১১.০৯.২৩